ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২. ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

২. ২. খারিজী সম্প্রদায়

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর এ ভবিষ্যদ্বাণী সর্বজনীন এবং সকল যুগেই এরূপ মানুষের আবির্ভাব হতে পারে। তবে সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ একমত যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম বাস্তবায়ন হয়েছিল খারিজীদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে।[1]

খারিজী সম্প্রদায়ের কর্মকান্ডেই আমরা ইসলামের ইতিহাসে উগ্রতা ও সন্ত্রাসের প্রথম ঘটনা দেখতে পাই। ৩৫ হিজরী সালে (৬৫৬খৃ) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান খলীফা উসমান ইবনু আফফান (রা) কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। বিদ্রোহীদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার মত কেউ ছিল না। তাঁরা রাজধানী মদীনার সাহাবীগণকে এ বিষয়ে চাপ দিতে থাকে। একপর্যায়ে আলী (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাপতি ও গভর্নরগণ আলীর আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু উসমান (রা) কর্তৃক নিযুক্ত সিরিয়ার গভর্নর মু'আবিয়া (রা) আলীর আনুগত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি দাবি জানান যে, আগে খলীফা উসমানের হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। আলী (রা) দাবি জানান যে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পূর্বে বিদ্রোহীদের বিচার শুরু করলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে পারে, কাজেই আগে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ক্রমান্বয়ে বিষয়টি ঘোরালো হয়ে গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। সিফ্ফীনের যুদ্ধে উভয়পক্ষে হতাহত হতে থাকে। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য একটি সালিসী মজলিস গঠন করেন।

এ পর্যায়ে আলীর (রা) অনুসারীদের মধ্য থেকে কয়েক হাজার মানুষ আলীর পক্ষ ত্যাগ করেন। এদেরকে 'খারিজী' অর্থাৎ দলত্যাগী বা বিদ্রোহী বলা হয়। এরা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ, যারা রাসূলুল্লাহর (ﷺ) ইন্তেকালের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের প্রায় সকলেই ছিলেন যুবক। এরা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান আবেগী মুসলিম। সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় ও সরাদিন যিক্র ও কুরআন পাঠে রত থাকার কারণে এরা 'কুর্রা' বা 'কুরআনপাঠকারী দল' বলে সুপরিচিত ছিলেন। এরা দাবি করেন যে, একমাত্র কুরআনের আইন ও আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই চলবে না। আল্লাহর নির্দেশ, অবাধ্যদের সাথে লড়তে হবে। আল্লাহ বলেছেন:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ

"মুমিনগণের দু দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর অত্যাচার বা সীমালঙ্ঘন করলে তোমরা জুলুমকারী বা সীমালঙ্ঘনকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।"[2]

এখানে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সীমালঙ্ঘনকারী দলের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না তারা ফিরে আসে। মু'আবিয়ার (রা) দল সীমালঙ্ঘনকারী, কাজেই তাদের আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে

যেতে হবে। আত্মসমর্পনের আগেই যুদ্ধ থামানো বা এ বিষয়ে মানুষকে সালিস বানানোর অর্থই আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার ব্যতিক্রম বিধান দেওয়া। এছাড়া আল্লাহ বলেছেন:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

‘‘হুকুম শুধু আল্লাহরই।’’[3]
কাজেই মানুষকে ফয়সালা করার দায়িত্ব প্রদান কুরআনের নির্দেশের স্পষ্ট লঙ্ঘন। আল্লাহ আরো বলেছেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

‘‘আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।’’[4]
আলী ও তার অনুগামীরা যেহেতু আল্লাহর নাযিল করা বিধান মত মু‘আবিয়ার সাথে যুদ্ধ না চালিয়ে, সালিসের বিধান দিয়েছেন, সেহেতু তাঁরা কাফির। তারা দাবি করেন, আলী (রা), মু‘আবিয়া (রা) ও তাঁদের অনুসারীরা সকলেই কুরআনের আইন অমান্য করে কাফির হয়ে গিয়েছেন। কাজেই তঁদের তাওবা করতে হবে। তাঁরা তাঁদের কর্মকে অপরাধ বলে মানতে অস্বীকার করলে তারা তাঁদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। খারিজীরা তাদের মতের পক্ষে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করতে থাকেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবী তাদেরকে এ মর্মে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পারঙ্গম হলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আজীবনের সহচর সাহাবীগণ। কুরআন ও হাদীসের তোমরা যে অর্থ বুঝেছ তা সঠিক নয়, বরং সাহাবীদের ব্যাখ্যাই সঠিক। এতে কিছু মানুষ উগ্রতা ত্যাগ করলেও বাকিরা তাদের মতকেই সঠিক বলে দাবি করেন। তারা সাহাবীদেরকে দালাল, আপোষকামী, অন্যায়ের সহযোগী ইত্যাদি মনে করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।[5]

সালিসি ব্যবস্থা আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা)-এর মধ্যকার বিবাদ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হওয়াতে তাদের দাবি ও প্রচারণা আরো জোরদার হয়। তারা আবেগী যুবকদেরকে বুঝাতে থাকে যে, আপোসকামিতার মধ্য দিয়ে কখনো হক্ক প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। কাজেই দীন প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের নির্দেশ অনুসারে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। ফলে বৎসর খানেকের মধ্যেই তাদের সংখ্যা ৩/৪ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২৫/৩০ হাজারে পরিণত হয়। ৩৭ হিজরীতে মাত্র ৩/৪ হাজার মানুষ আলীর (রা) দল ত্যাগ করেন। অথচ ৩৮ হিজরীতে নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে আলীর বাহিনীর বিরুদ্ধে খারিজী বাহিনীতে প্রায় ২৫ হাজার সৈন্য উপস্থিত ছিল।[6]

তারা মনে করে, যেহেতু আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা) মুসলিম উম্মাহকে খোদাদ্রোহিতার মধ্যে নিমজ্জিত করেছেন, সেহেতু তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করলেই জাতি এ পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার পাবে। এজন্য আব্দুর রাহমান ইবনু মুলজিম নামে একব্যক্তি ৪০ হিজরীর রামাদান মাসের ২১ তারিখে ফজরের সালাতের পূর্বে আলী যখন বাড়ি থেকে বের হন, তখন বিষাক্ত তরবারী দ্বারা তাঁকে আঘাত করে। আলীর (রা) শাহাদতের পরে উত্তেজিত সৈন্যেরা যখন আব্দুর রাহমানের হস্তপদ কর্তন করে তখন সে মোটেও কষ্ট প্রকাশ করে না, বরং আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু যখন তারা তার জিহবা কর্তন করতে চায় তখন সে অত্যন্ত আপত্তি ও বেদনা প্রকাশ করে। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, আমি চাই যে, আল্লাহর যিক্র করতে করতে আমি শহীদ হব![7]

এ গুপ্তঘাতককে প্রশংসা করে তাদের এক কবি ইমরান ইবনু হিত্তান (৮৪ হি) বলেন: ‘‘কত মহান ছিলেন সে

নেককার মুত্তাকি মানুষটি, যিনি সে মহান আঘাতটি করেছিলেন! সে আঘাতটির দ্বারা তিনি আরশের অধিপতির সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই চান নি। আমি প্রায়ই তাঁর স্মরণ করি এবং মনে করি, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সাওয়াবের অধিকারী মানুষ তিনিই।’’[৪]
আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবী এদের নিষ্ঠা ও ধার্মিকতার কারণে এদের প্রতি অত্যন্ত দরদ অনুভব করতেন। তাঁরা এদেরেকে উগ্রতার পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারা তাদের ‘ব্রান্ডের’ ইসলাম বা ইসলাম সম্পর্কে তাদের নিজস্ব চিন্তা ও ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। আলীকে প্রশ্ন করা হয়: এরা কি কাফির? তিনি বলেন, এরা তো কুফরী থেকে বাঁচার জন্যই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বলা হয়, তবে কি তারা মুনাফিক? তিনি বলেন, মুনাফিকরা তো খুব কমই আল্লাহর যিক্র করে, আর এরা তো রাতদিন আল্লাহর যিক্রে লিপ্ত। বলা হয়, তবে এরা কী? তিনি বলেন, এরা বিভ্রান্তি ও নিজ-মত পূজার ফিতনার মধ্যে নিপতিত হয়ে অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছে।[৭]

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এদের সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। আরবী সাহিত্যে এদের কবিতা ইসলামী জযবা ও জিহাদী প্রেরণার অতুলনীয় ভান্ডার।[10] এদের ধার্মিকতা ও সততা ছিল অতুলনীয়। রাতদিন নফল সালাতে দীর্ঘ সাজদায় পড়ে থাকতে থাকতে তাদের কপালে কড়া পড়ে গিয়েছিল। তাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে গেলে শুধু কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজই কানে আসতো।[11] কুরআন পাঠ করলে বা শুনলে তারা কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে যেত।[12] পাশাপাশি এদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাস ছিল ভয়ঙ্কর। ৩৭ হিজরী থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এদের সন্ত্রাস, হত্যা ও যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ৬৪-৭০ হিজরীর দিকে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর ও উমাইয়া বংশের শাসকগণের মধ্যে যুদ্ধে তারা আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরকে সমর্থন করে। কারণ তাদের মতে, তিনিই সত্যিকার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন উসমান (রা) ও আলী (রা)-কে কাফির বলতে অস্বীকার করলেন, উপরন্তু তাঁদের প্রশংসা করলেন তখন তারা তার বিরোধিতা শুরু করে।

৯৯-১০০ হিজরীর দিকে উমাইয়া খলীফা উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের ধার্মিকতা ও নিষ্ঠার কারণে তাদেরকে বুঝিয়ে ভাল পথে আনার চেষ্টা করেন। তারা তাঁর সততা, ন্যায়বিচার ও ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণের বিষয়ে একমত পোষণ করে। তবে তাদের দাবি ছিল, উসমান (রা) ও আলী (রা)-কে কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত বিধান প্রদান করেছন। এছাড়া মু‘আবিয়া (রা) ও পরবর্তী উমাইয়া শাসকদেরকেও কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে শাসকদের মনগড়া আইনে দেশ পরিচালনা করেন। যেমন, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজকোষের সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহারে শাসকের ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি। উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের এ দাবী না মানাতে শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁর নিজের শাসনকার্য ইসলাম সম্মত বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে।[13]

এরা মনে করত যে, ইসলামী বিধিবিধানের লঙ্ঘন হলেই মুসলিম ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয়। তারা এরূপ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ‘ইসলাম প্রতিষ্ঠা’ বা রাজনৈতিক পর্যায়ে ইসলামী বিধিবিধান তাদের ধারণামত ‘‘পরিপূর্ণ’’ বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে দলবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করে। এছাড়া তারা আলীকে কাফির মনে করেন না এরূপ সাধারণ অযোদ্ধা পুরুষ, নারী ও শিশুদের হত্যা করতে থাকে।[14] উলেখ্য যে, অধিকাংশ সাহাবী আলী (রা) ও মু‘আবিয়া (রা)-এর মধ্যকার রাজনৈতিক মতবিরোধ ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে

বিরত ছিলেন। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইবনু সিরীন (১১০ হি) বলেন, ‘‘যখন ফিতনা শুরু হলো, তখন হাজার হাজার সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে ১০০ জন সাহাবীও এতে অংশ গ্রহণ করেননি। বরং এতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা ৩০ জনেরও কম ছিল।’’[15] এ সকল সাহাবী ও অন্যান্য সাহাবী-তাবিয়ী নৈতিকভাবে আলীর (রা) কর্ম সমর্থন করতেন। তাকে পাপী বা ইসলামলঙ্ঘনকারী বলতে কখনোই রাজি হতেন না। খারিজীগণ এদেরকেও কাফির বলে হত্যা করত।

একটি নমুনা দেখুন! সাহাবী খাববার ইবনুল আরাত-এর পুত্র আব্দুল্লাহ তাঁর স্ত্রী পরিজনদের নিয়ে পথে চলছিলেন। খারিজীগণ তাঁকে উসমান (রা) ও আলী (রা) সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তিনি তাঁদের সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করেন এবং সন্ত্রাস ও হত্যার ভয়ানক পরিণতির বিষয়ে হাদীস বলেন। তখন তারা তাঁকে নদীর ধারে নিয়ে জবাই করে এবং তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী ও অন্যান্য নারী ও শিশুকে হত্যা করে। এসময়ে তারা একস্থানে বিশ্রাম করতে বসে। তথায় একটি খেজুর গাছ থেকে একটি খেজুর ঝরে পড়লে একজন খারিজী তা তুলে নিয়ে মুখে দেয়। তখন অন্য একজন বলে, তুমি মূল্য না দিয়ে পরের দ্রব্য ভক্ষণ করলে? লোকটি তাড়াতাড়ি খেজুরটি উগরে দেয়। আরেকজন খারিজী একটি শূকর দেখে তার দেহে নিজের তরবারী দিয়ে আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ তার বন্ধুরা প্রতিবাদ করে বলে, এতো অন্যায়, তুমি এভাবে আল্লাহর যমিনে বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছ ও পরের সম্পদ নষ্ট করছ! তখন তারা শূকরের অমুসলিম মালিককে খুঁজে তাকে টাকা দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়।[16]

এভাবে তারা অমুসলিমদের বিষয়ে ইসলামের উদারতা গ্রহণ করছে, সামান্য একটি খেজুরের বিষয়ে বান্দার হক্ক নষ্ট করাকে ভয় পাচ্ছে, অথচ ভিন্নমতাবলম্বী মুসলিমকে বিভিন্ন অযুহাতে কাফির বলে ইসলামের নামে তাকে হত্যা করছে এবং নিরস্ত্র নারী ও শিশুদেরকেও হত্যা করছে।

খারিজীগণের বিভ্রান্তিকর মতবাদের অন্যতম ছিল:

(১) ইসলামের নির্দেশনা বা কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে নিজেদের বুঝকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা। এক্ষেত্রে সাহাবীগণের মতামতের গুরুত্ব অস্বীকার করা।

(২) হাদীস মানলেও সুন্নাত বা আলোচ্য ও বিতর্কিত বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)এর প্রায়োগিক কর্ম ও কর্মপদ্ধতির গুরুত্ব অস্বীকার করা।

(৩) পাপের কারণে মুসলিমকে কাফির বলা।

(৪) কাফির হত্যার ঢালাও বৈধতা দাবি করা।

(৫) রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শরয়ী গুরুত্ব অস্বীকার করা।

(৬) রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের পাপের কারণে রাষ্ট্রকে কাফির রাষ্ট্র বলে গণ্য করা।

(৭) এরূপ রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্যকারী নাগরিকদেরকে কাফির বলা।

(৮) এরূপ কাফির রাষ্ট্র ও নাগরিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৈধ বলা।

(৯) জিহাদকে ফরয আইন, বড় ফরয ও দীনের রুকন বলে দাবি করা।

(১০) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের নামে শাস্তি প্রদান।

(১১) তাদের মতের বিরোধী সকল আলিমকে অবজ্ঞা করা।[17]

ফুটনোট

[1] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৯৩-৪১১।

[2] সূরা হুজরাত, ৯ আয়াত।

[3] সূরা আনআম, ৫৭ আয়াত, সূরা ইউসূফ, ৪০ ও ৬৭ আয়াত।

[4] সূরা মায়িদা, ৪৪ আয়াত।

[5] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৫/১৬৫-১৬৬; ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলি, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৪৭-৪৮।

[6] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৮২-৪৩০; মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৫৯।

[7] মুবাররিদ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ (২৮৫ হি.), আল-কামিল, ৩/১১২০।

[8] মুবাররিদ, আল-কামিল, ৩/১০৮৫।

[9] ইবনুল আসীর, মুহাম্মাদ ইবনুল মুবারাক (৬০৬ হি.), আন-নিহাইয়াহ ফী গারিবীল হাদীস ২/১৪৯।

[10] বিস্তারিত দেখুন, মুবাররিদ, আল-কামিল।

[11] ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি.), তালবীসুল ইবলীস, পৃ. ৮৩-৮৪।

[12] আল-আজুররী, মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন (৩৬০ হি.), আশ-শারী'আহ, পৃ. ৩৭।

[13] ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলি, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৫১-৬১।

[14] আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি.), আল-মুসনাদ ৫/১১০, ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৭৮-৩৯১; ড. আহমদ, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৫১-৬১।

[15] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৫১।

[16] ইবনুল জাওযী, তালবীসুল ইবলীস, পৃ. ৮৪-৮৫।

[17] খারিজীগণের এ সকল বিভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি অপনোদনে সাহাবীগনের প্রচেষ্টা জানতে দেখুন: ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ: একটি পর্যালোচনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6896

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন